প লা শ ব র ন পা ল

# কল্পবিজ্ঞান

কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ঠিক কীভাবে দেওয়া যায়, তা নিয়ে চিন্তা করতে বসলে নানারকম কূট প্রশ্ন মনে জাগতে থাকে। ১৯৬০ কি '৭০-এর দশকে, যখন আমরা ছোটো ছিলাম, তখন এই শব্দটার চল হয়নি, *বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প* বলে কিছু কিছু গল্প চিহ্নিত থাকতো কিশোরদের উপযোগী পত্রপত্রিকায় বা সাহিত্য সংকলনে। সেই শব্দটারই জায়গায় এখন এসেছে *কল্পবিজ্ঞান* কথাটা। একদিক থেকে মনে হয়, ভালোই হয়েছে, বিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে শুধু যে গল্পই লেখা যায় তা ভাববো কেন, কবিতাও তো লেখা যেতে পারে! *কল্পবিজ্ঞান* শব্দটার মধ্যে কবিতারও স্থান হতে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু অন্য দিক থেকে একটু মন্দও বোধহয় হয়েছে, কারণ *কল্পনা* শব্দটার ছায়া ঢুকে গেছে নামের মধ্যে। কতোটা কল্পনার সঙ্গে কতোটা বিজ্ঞানের মিশেল দিলে সার্থক কল্পবিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে, তার কোনো মানদণ্ড কেউ তৈরি করে দেয়নি, দেওয়া হয়তো সম্ভবও নয়। যতোক্ষণ নামটার মধ্যে *বিজ্ঞানভিত্তিক* শব্দটা ছিলো ততোক্ষণ অন্তত পরিষ্কার বোঝা যেতো গল্পের ভিত্তিটা কোথায় হওয়া উচিত। নতুন নামে সেই বাধকতাটাও আর নেই, অতএব কল্পনার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকার দরকার নেই। ফলে এমন অনেক রচনা সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোকে স্রষ্টারা—বা অন্তত তাঁদের প্রকাশক-পরিবেশকেরা—কল্পবিজ্ঞান হিশেবে ভেবেছেন বা চিহ্নিত করেছেন, অথচ তার মধ্যে শুধু কল্পনাই আছে, বিজ্ঞানের ছিটেফোঁটাও নেই।

এটা শুধু বাংলা ভাষার কথা নয়। ইংরিজি ভাষা নিঃসন্দেহে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ভাষা, তাই এ ভাষাতেই পাঠকের সংখ্যা সর্বাধিক তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। ইংরিজিতেও 'সায়েন্স ফিকশন' গোত্রে যে সব রচনা অন্তর্ভুক্ত

করা হয় তার মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ কেবলই ফিকশন, তাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। লিখিত-মুদ্রিত রচনা ছাড়া অন্য রকমের শিল্পমাধ্যমও আছে—যার মধ্যে চলচ্চিত্রের কথাই এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সেখানেও এই একই চিত্র, কল্পবিজ্ঞানের তকমা অসঙ্গতভাবে পেয়ে যাচ্ছে বহু সিনেমা। এতে কল্পনার বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে কিনা জানি না, তবে বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে কথায় একটু পরে আসবো, তার আগে অন্য একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করাটা আরো জরুরি। প্রশ্নটা হল, বিজ্ঞানের সঙ্গে কোনো যোগাযোগই যদি না থাকে, তাহলে লেখক বা পরিবেশকই বা এগুলোকে কল্পবিজ্ঞান ভাবেন কী করে?

সত্যি সত্যি তাঁরা কী ভাবেন তা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যায় না। হয়তো তাঁরা জানেন, কল্পবিজ্ঞান বলে প্রচার করতে পারলে লেখার বাজার বাড়বে, এবং বাজারই সব কিছুর শেষ যুক্তি। কিন্তু এ কথা বলে সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় বলে মনে হয় না, কেননা একবার এই যুক্তির হাত ধরে বেশ কিছু রচনা কল্পবিজ্ঞানের গোত্রভুক্ত হয়ে গেলে পাঠকদের মনেও এই গোত্রের সংজ্ঞা বদলে যেতে থাকে, ফলে পরবর্তীকালে সেই পাঠকেরা অনুরূপ রচনা দেখলে বিজ্ঞাপনের দ্বারা সচেতনভাবে প্রভাবিত না হয়েও তাকে কল্পবিজ্ঞান বলে ভাবতে থাকেন। এই পাঠকদের মধ্যেও কেউ কেউ পরে লেখক বা প্রকাশক হন, তাঁরা কল্পবিজ্ঞান বলতে ওই গোত্রের লেখাই বোঝেন। অর্থাৎ লেখক ও পরিবেশকেরা সকলেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাঠককে ভুল বোঝাতে চাইছেন, ব্যাপারটা সেরকম নয়। নানাভাবে তাঁরা নিজেরাও বিভ্রান্ত হন এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করেন।

এই বিভ্রান্তির একটি বড়ো উপকরণ হলো প্রযুক্তি। প্রযুক্তিগত নানারকমের উদ্ভাবনের কথা চিন্তা করে কিছু লিখলেই সেটা বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা হয় না। রামায়ণে পুষ্পক রথ নামক একটি উড়ন্ত যানের কথা আছে। চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ন টাইমস' সিনেমায় দেখানো হয়েছে একটি আশ্চর্য যন্ত্র যার সঙ্গে লাগানো চেয়ারে কেউ গিয়ে বসলেই যন্ত্রটি খাবারের থালা বার করে তার মুখে খাবার গুঁজে দেয় এবং খাওয়া শেষ হলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়েও দেয়। আশা করি সেজন্য কেউ বলেন না যে রামায়ণ বা মডার্ন টাইমস কল্পবিজ্ঞানের দলে। কিন্তু এমন অনেক বই বা সিনেমার কথা বলা যায় যেগুলোর নাম হয় কল্পবিজ্ঞান হিশেবে, অথচ তাদের কাহিনীর উপাদান আমাদের আটপৌরে জীবনের মতোই দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রেম-বিদ্বেষ আশাভঙ্গ-ইচ্ছাপূরণ ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই নয়—তফাত কেবল এই যে গোটা ঘটনাটা ঘটে একটি মহাকাশযানের ভেতরে। আমার বন্ধু দীপঙ্কর রায় এই ধরনের কল্পবিজ্ঞানের নাম দিয়েছিলো 'মহাশূন্যে

মলত্যাগ'। যে আমলে বলেছিলো কথাটা, তখনো 'শপিং মল' চালু হয়নি আমাদের দেশে, অতএব 'মলত্যাগ' কথাটার একটাই অর্থ ছিলো। মহাকাশযানে বসে সেই কর্মটি করলেও তার বিবরণ পেয়ে যায় কল্পবিজ্ঞান আখ্যা।

কল্পবিজ্ঞানের তকমা লাগানোর জন্য দ্বিতীয় যে উপকরণটি বহুল ব্যবহৃত হয় তা হলো মানুষের কথাবার্তা ও আচরণের কিছু অদ্ভুত ধরন। কী করে যেন একদল লেখকের মনে বদ্ধমূল ধারনা জন্মেছে যে বিজ্ঞান যাঁরা করেন তাঁরা ভয়ঙ্কর কাঠখোট্টাভাবে কথা বলেন, তাঁদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস তো দূরের কথা মায়া-মমতা-স্নেহ ইত্যাদি সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোও পুরোপুরি অনুপস্থিত থাকে। এবং তারপরে আর এক ধাপ এগিয়ে মনে করেন, যে কোনো গল্পের মধ্যে ওই রকম কথাবার্তা পুরে দিতে পারলেই, এবং তার সঙ্গে কালীপটকার মতো বিজ্ঞানের কয়েকটা পারিভাষিক শব্দ যোগ করে দিতে পারলেই সে গল্প কল্পবিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। এটা প্রথমটার চেয়েও খারাপ। প্রথমোক্ত ধরনের বিভ্রান্তির শিকার যে সব কাহিনী সেগুলো বিজ্ঞানের উপাদানরহিত হয়েও ভালো কাল্পনিক কাহিনী হতে পারে, কিন্তু এই দ্বিতীয় ধরনের উপকরণ যেখানে ব্যবহার হয় সেখানে কল্পনার দৈন্যও প্রকট হয়ে পড়ে।

দু ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। দুটোতেই মনে হয় বিজ্ঞান ব্যাপারটা কী, কেমন তার গতিপ্রকৃতি, এ সব সম্পর্কে লেখকের ভালো ধারনা নেই। বিজ্ঞান না থাকলে প্রযুক্তি হয় না তা ঠিক, কিন্তু বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এক জিনিশ নয়। প্রকৃতির কাজকর্মের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বার করে বিজ্ঞান। আর প্রযুক্তির কাজ বিজ্ঞানের ফলাফল কাজে লাগিয়ে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেওয়া। নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য কীসে আসবে তা ভাববার জন্য বিজ্ঞানবোধের প্রয়োজন হয় না, তাই প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের কথা কল্পনা করার জন্য বিজ্ঞাননির্ভর হওয়ার দরকার পড়ে না। সকালবেলা বাজার করতে যেতে হবে শুনেই আমার কল্পনায় আসতে পারে এমন একটি যন্ত্রের কথা যাকে বাজারের ফর্দ দিয়ে দিলেই সে গিয়ে নিজে নিজে বাজারটা করে নিয়ে আসে। যেই শুনলাম অফিসের কাজে দূরে কোথাও যেতে হবে, ওমনি মনে হলো, আহা এমন যদি একটা কিছু থাকতো যাতে আমার বাড়ির ছাদ থেকে সোঁ করে সে জায়গায় চলে যাওয়া যেতো তিন মিনিটে, কী ভালোই না হতো! মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে মনে হয়, এমন যদি একটা টিকে বা ইঞ্জেকশন নিয়ে নেওয়া যেতো যাতে মশারা গায়ে হুল ফোটাতেই পারতো না, তাহলে খুব মজা হতো। এরকম কল্পনা সকলেই অল্পবিস্তর করেন। কেউ কেউ এরকম কল্পনার কথা লিখে ফেলেন, বা এই নিয়ে সিনেমা করেন। এর মধ্যে বিজ্ঞানের কিছু নেই, তবে উৎকৃষ্ট কল্পনা থাকতেই পারে,

যে কথা আগে বলছিলাম। কিন্তু যাঁরা ভাবেন বিজ্ঞানবোধ মানুষকে নীরস করে, হাসি-তামাশা থেকে বিরত করে মানুষকে খটাখট খটাখট করে কথা বলতে শেখায়, তাঁরা বিজ্ঞান সম্পর্কে ভুল ধারনা পোষণ করেন। সেই ধারনার প্রচার করে তাঁরা বিজ্ঞান সম্পর্কে ভুল বোঝান পাঠককে। এতে বিজ্ঞানের ক্ষতি হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

*এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি,*
*হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।*

তেমনি এ কথাও বলা যায়, এমন বিজ্ঞান কখনোই আমাদের আয়ত্ত হবে না যাতে মানুষ হাসতে ভুলে যাবে, বা অন্য কেউ হাসলে সেটা অশালীন বলে মনে করবে। মানবিক সম্পর্কের এরকম আপজাত্য নিয়ে যে সব সাহিত্য বা সিনেমা তৈরি হয় সেগুলো বিজ্ঞানের পক্ষে ক্ষতিকর, কল্পনার বিচারে হাস্যকর।

এর সঙ্গে অনেক সময়ে আবার যোগ হয় একেবারে বিজ্ঞানবিরোধী কল্পনা। অর্থাৎ বিজ্ঞান যেটাকে একেবারে অসম্ভব বলে দিচ্ছে, সেটা নিয়ে গল্প ফাঁদা। তথাকথিত কল্পবিজ্ঞানের সিনেমায় দেখেছি, একজন লোক চান করার শাওয়ারের মতো একটা কিছুর তলায় দাঁড়ালো, তার ওপর একটা কোনো রকমের রশ্মি এসে পড়লো, আর ওমনি সেই লোকটা ভুস করে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আশেপাশের অন্যান্যদের কথা থেকে বোঝা গেলো, লোকটিকে নাকি পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। নিছক আজগুবি গল্প হিশেবে এটাকে মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না, কিন্তু একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেলো—বন্ধু বললো এটা নাকি বেশ উঁচুদরের কল্পবিজ্ঞান। আমার আপত্তির উত্তরে সে জানালো যে এর মধ্যে আজগুবি কিছুই নেই, আইনস্টাইন নাকি আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে $E=mc^2$, অর্থাৎ যার ভর ($m$) আছে তাকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, এবং তাতে কী পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে সেটাই আইনস্টাইনের ওই বিখ্যাত সমীকরণের $E$। আমি তাকে বললাম যে কথাটার মধ্যে একটু বদহজমের লক্ষণ আছে। আইনস্টাইন মোটেই বলেননি যার ভর আছে তাকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে। যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হলো, $m$ পরিমাণ ভর যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে কতোটা শক্তি উৎপন্ন হবে। 'যদি' কথাটা এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো পদার্থকে পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যে যায় না, সেটাও বিজ্ঞান জানে। বিজ্ঞান জানে যে পদার্থের এমন কিছু কিছু ধর্ম থাকে যেগুলোকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়। এমন একটি হলো ব্যারিয়নাঙ্ক বলে একটা জিনিশ। আমাদের শরীরে যে সব পরমাণু আছে তাদের

নিউক্লিয়াসে আছে প্রোটন আর নিউট্রন। এই দু রকমের কণারই ব্যারিয়নাঙ্ক আছে, আলো বা অন্য কোনো রকমের শক্তির ব্যারিয়নাঙ্ক শূন্য। অতএব প্রোটন-নিউট্রন ইত্যাদি কণা কেবল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে, এটা অসম্ভব। তাহলে এই ধরনের ব্যাপারস্যাপার যে কাহিনীতে থাকে তাকে বিজ্ঞানভিত্তিক বলার কোনোই মানে হয় না। বিজ্ঞানের সঙ্গে এ সব কাহিনীর কোনো সম্পর্ক নেই। রূপকথার আজগুবি গল্পে যেমন রাক্ষসের নাক দিয়ে আগুন বেরোয় বা পক্ষীরাজ ঘোড়া আকাশে ওড়ে, এগুলো সে রকম ব্যাপার। পক্ষীরাজের সঙ্গে রকেট বা কোনো ধরনের মহাকাশযান জুড়ে দিলেই রূপকথার গল্প ওমনি কল্পবিজ্ঞানের গল্প হয়ে যায় না।

এরকম বললে কেউ-কেউ আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'ও মা! পুরোপুরি বিজ্ঞান মেনে লিখতে হলে কল্পনা আসবে কোথা থেকে? কল্পনা না ঢোকালে গল্প হবে কেন?' ভালো কথা, গল্পের মধ্যে কল্পনার অংশ থাকবে এতে আপত্তির কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু সঙ্গে খানিকটা বিজ্ঞান না থাকলে যে কল্পবিজ্ঞান হবে না, সেটাও তো ঠিক! বিজ্ঞানের বিরোধিতা করে যদি কল্পনার বীজ রোপণ করতে হয়, তাহলে আর যাই হোক সে কল্পনা বিজ্ঞানভিত্তিক হয় না। ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী রচনা করতে গিয়ে কেউ যদি এমন এক যুগের কল্পনা করেন যখন মানুষ বল্কল পরে গুহায় বাস করতো কিন্তু এক গুহা থেকে অন্য গুহায় যাওয়ার জন্য মোটোরগাড়ি ব্যবহার করতো, তাহলে মনে হয় লেখকের ইতিহাসবোধে ঘাটতি আছে। তেমনি, কেউ যদি এমন কাহিনী রচনা করেন যার কুশীলবেরা রকেটে করে যাতায়াত করে কিন্তু বৈদ্যুতিক চার্জ কাকে বলে তা জানে না, তাহলে সে লেখকের বিজ্ঞানবোধ সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ জাগবে, এবং তাঁর লেখা গল্পকে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প বা কল্পবিজ্ঞান বলে মেনে নিতে আমাদের সঙ্কোচ হবে।

এতো রকমের নেতি-নেতি কথা বলার পরে আমার প্রধান যে কর্তব্যটি বাকি থেকে যাচ্ছে তা হলো, কল্পবিজ্ঞানের উপজীব্য কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু বলা। প্রকারান্তরে, কী কী থাকবে না তা বলতে বলতেই সে কথা হয়তো বলা হয়ে গেছে। তাই সূত্রের আকারে সে কথা না লিখে বরং কিছু নমুনার কথা উল্লেখ করে দেখানো যাক, বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্পনার সার্থক মিশ্রণ কীরকম হতে পারে।

বাংলায় প্রথম সার্থক কল্পবিজ্ঞান লিখেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। একটি তেল কোম্পানি আয়োজন করেছিলো একটি গল্প প্রতিযোগিতা। শর্ত ছিলো, গল্পের মধ্যে কোথাও না কোথাও ওই তেলের নাম থাকতে হবে। জগদীশচন্দ্র যে গল্পটি লিখলেন তার নাম "পলাতক তুফান" [১]। এক সমুদ্রযাত্রার বিবরণ—সমুদ্রে ভয়ানক ঢেউ

উঠেছিলো, জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম, তখন প্রাণ বাঁচাতে লেখকের মাথায় বুদ্ধি খেললো, তাঁর কাছে ছিলো মাথায় মাখার তেলের শিশি, ছিপি খুলে সেই শিশি সমুদ্রে ছুঁড়ে মারলেন, মুহূর্তের মধ্যে সমুদ্র শান্ত হয়ে গেলো। বলা বাহুল্য যে তেল ছিলো শিশিতে তা ওই প্রতিযোগিতার আয়োজক কোম্পানির তেল, কিন্তু আমাদের আলোচনায় সে কথা অবান্তর।

কেন এটাকে সার্থক কল্পবিজ্ঞান বলছি তা এবারে দেখা যাক। আমরা জানি সাবান-জলে ফেনা হয়। বাড়িতে সাবান-জল হাতে ঘেঁটে ফেনা তৈরি করে তার মধ্যে এক ফোঁটা তেল ঢেলে দিন; দেখবেন ফেনার বুদবুদ সব ফেঁটে যাচ্ছে, জলের ওপরটা সমান হয়ে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে? তার কারণ তেল হলো সাবানের উল্টোরকমের রাসায়নিক পদার্থ, যেজন্য হাতে তেল লেগে গেলে সাবান দিয়ে আমরা তা পরিষ্কার করি। তেল দিলে জলতল সমান থাকার দিকে মতি হয়, উঁচু-নিচু সহ্য হয় না। বুদবুদ যে কারণে হয় না, সেই একই কারণে তেল দিলে জলে ঢেউ ওঠারও অসুবিধে। বিজ্ঞানের এই পর্যবেক্ষণটিই জগদীশচন্দ্রের গল্পের প্রধান উপজীব্য। তবে কিনা, মাত্র এক শিশি তেলে গোটা বঙ্গোপসাগর শান্ত হয়ে যাবে, এমন জোরালো তেলের সন্ধান কেউ জানে না, যদিও এমন তেলের অস্তিত্ব যে অসম্ভব তার কোনো প্রমাণ নেই। এতো জোরালো তেল যে আছে, সেইটুকু লেখকের কল্পনা, বা অতিরঞ্জন। এই অতিরঞ্জনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের একটি তত্ত্ব বা নিয়মের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে পাঠকের—এই কারণেই এটি বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প। বা, এখনকার ভাষায় বলতে গেলে, কল্পবিজ্ঞান।

তার মানে, বলতে চাইছি যে, পাঠকের মনে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনা উশকে দেবে যে কাহিনী, সেইটিই যথার্থ কল্পবিজ্ঞান। অথবা উশকে দেবে এমন কোনো তথ্যের কথা, যে তথ্য আমরা জানতে পারি বিজ্ঞানচর্চা করে। এই উশকে দেওয়ার কাজটি করার জন্য খানিকটা কল্পনা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সে কল্পনা বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। যে কথাটা বলতে চাইছি তা সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলেছেন রুশ লেখক ইভান ইয়েফ্রেমভ, তাঁর একটি গল্প সংকলনের ভূমিকায় [২]—"আমার মতে বৈজ্ঞানিক কাহিনীর কাজ হল, যে রহস্যময় পর্দায় পথগুলো ঢাকা রয়েছে, সে পর্দা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা, যেসব বৈজ্ঞানিক কীর্তি এখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি তাদের কথা বলা, এইভাবে বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া।" আমি এর সঙ্গে আর একটু যোগ করতে চাই। বৈজ্ঞানিক যে সব আবিষ্কার এখোনো ঘটেনি শুধু তাদের কথা নয়, যে সব আবিষ্কার ঘটে গেছে তাদের কথা গল্পের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়ার কাজটিও করতে পারে কল্পবিজ্ঞান—যেমন করেছেন জগদীশচন্দ্র, উল্লিখিত গল্পটিতে।

অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞানের গল্প হলেই যে সেটা ভবিষ্যৎকালে সংঘটিত হতে হবে, অবিশ্বাস্য চোখধাঁধানো কিছু যন্ত্রপাতি থাকতে হবে তার মধ্যে, এর কোনো মানে নেই। দরকার যা, তা হলো বিজ্ঞানকে দেখার একটা চোখ, যা দিয়ে দেখা যায় বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি, বোঝা যায় কী রহস্য উন্মোচিত হতে পারে বিজ্ঞানের দ্বারা।

যাঁর নাম আগেই উল্লেখ করেছি, সেই ইভান ইয়েফ্রেমভের একটি গল্পের কথা ধরা যাক। গল্পের নাম 'দেনি-দের', কথাটার অর্থ গল্পের মধ্যেই বলা আছে, 'পাহাড়ী প্রেতাত্মার হ্রদ'। রাশিয়ার আলতাই পর্বত সংলগ্ন অঞ্চলে এক চিত্রশিল্পীর আঁকা একটি ছবি দেখেছিলেন লেখক। গল্পের নাম থেকেই আন্দাজ করা যাচ্ছে, ছবিটি একটি হ্রদের। পাহাড়ে ঘেরা হ্রদ। অপূর্ব সুন্দর। খুঁটিয়ে তাকাতেই

*সরু পাহাড়টার পায়ের কাছে সবুজে সাদায় মেশান ক্ষীণ উদ্ভাসিত বাষ্প চোখে পড়ল। উজ্জ্বল বরফের ছায়ার উপর দিয়ে তার প্রতিফলন জলের উপর পড়ে দীর্ঘ ছায়ার সৃষ্টি করেছে, সে ছায়াগুলো আবার কেন জানি লাল রঙের। পাথরের গায়ে দেখা যাচ্ছে আরো ঘন, রক্তের মতো লাল ছায়া। পাহাড়ের সাদা গায়ে যেখানে যেখানে সূর্যের আলো পড়েছে সেখানে বরফ আর পাথরের উপর দিয়ে উঠে গেছে নীলচে সবুজ ধোঁয়া বা বাষ্পের দীর্ঘ স্তম্ভ, ঠিক যেন মানুষের শরীর।*

চিত্রশিল্পী জানালেন, ওই ধোঁয়াগুলো অশরীরী প্রেতাত্মা, তারা আছে বলে ওই হ্রদের ধারেকাছে যাওয়া যায় না, গেলে মানুষে অসুস্থ হয়ে পড়ে প্রেতাত্মার ছোঁয়ায়, চিত্রশিল্পী নিজেও বহুকাল অসুস্থ ছিলেন এই ছবি আঁকার পরে। এতো হুঁশিয়ারি শোনার পরেও লেখকের অদম্য ইচ্ছে রয়ে গেলো ওই হ্রদ দেখার, হ্রদের রহস্য বোঝার। ক্রমশ তিনি বুঝতে পারলেন, ওই ধোঁয়া জলীয় বাষ্প নয়। পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে পারদের এক বিশাল সঞ্চয়—পারদ উদ্বায়ী পদার্থ বলে তা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পারদের ধোঁয়া নীলচে সবুজ রঙের হয়, ঠিক যেমনটি এঁকেছিলেন চিত্রশিল্পী। পারদের ধোঁয়া বিষাক্ত, সেই জন্যই অসুস্থ হয়ে পড়ে মানুষ।

চমৎকার গল্প। পারদের বিভিন্ন ধর্ম আলোচনা করতে করতে যেভাবে গল্প এগিয়েছে, তাতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বা গবেষণার আস্বাদ পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিকেরা কীভাবে আবিষ্কার করেন সঞ্চিত কোনো পদার্থের সম্ভার, তারও একটা বেশ বিস্তারিত রূপরেখা মেলে গল্প পড়তে গিয়ে। কোনো আশ্চর্য যন্ত্রপাতি নেই, কোনো অসম্ভব ঘটনা নেই, কিন্তু গল্প এগিয়েছে বিজ্ঞানের হাত ধরে।

তার মানে এ নয় যে আশ্চর্য যন্ত্রপাতি কিছু থাকলেই তা কল্পবিজ্ঞান পদবাচ্য হতে পারবে না। অবশ্যই পারবে, যদি সেই যন্ত্র শুধুই কল্পলোকের দূত না হয়, যদি তার সঙ্গে

বিজ্ঞানের একটা যোগসূত্র দেখাবার চেষ্টা করা হয়। কল্পবিজ্ঞানের জগতের যিনি মহাপুরুষ, সেই জুল ভের্ন-এর "পৃথিবী থেকে চাঁদে" উপন্যাসের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। যে শকটে চেপে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার কথা বলেছেন ভের্ন, তা সে আমলের বিচারে অত্যাশ্চর্য তো বটেই! কিন্তু তার কথা শুধু কল্পনা করেই ক্ষান্ত হননি ভের্ন, সেরকম একটি মহাকাশযান তৈরি করতে গেলে কী ধরনের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রশ্ন আসবে তা নিয়েও আলোচনা করেছেন গল্পের ছলে। এই কারণেই এ কাহিনী হয়ে উঠেছে সার্থক কল্পবিজ্ঞান, এবং পরবর্তীকালে মহাকাশ গবেষণায় ইন্ধন জুগিয়েছে। এর সঙ্গে তুলনা করুন বিধুশেখর নামক রোবটের, যার দেখা আমরা পাই সত্যজিৎ রায়ের লেখা বেশ কিছু গল্পে। তার মধ্যে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই। আমার একটা রোবট আছে যে রোজ সকালে আমাকে চা করে খাওয়ায়—এরকম কল্পনা যদি আমি করি তাতে কেউ বাধা দিতে পারে না, সে কল্পনা হয়তো কোনোদিন বাস্তবায়িত হতেও পারে, কিন্তু আজকে বসে এ কথা লিখলেই তা কল্পবিজ্ঞান হয়ে যায় না। যে কথা আগেই বলেছি, তাহলে রামায়ণকেও কল্পবিজ্ঞান বলতে হয়।

আবার, আশ্চর্য ও অভাবনীয় যন্ত্রপাতি কিছু না থেকেও যে কল্পবিজ্ঞান হতে পারে, তার নিদর্শনও পাওয়া যায় ভের্নের লেখায়। "আশ্চর্য দ্বীপ" উপন্যাসের কথা ধরা যাক। জনহীন একটি দ্বীপে আটকা পড়ে কয়েকজন মানুষ যেভাবে আগুন জ্বালানোর উপায় থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে তা থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাসেরই যেন একটা রূপরেখা পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এর মধ্যে কোনো অভূতপূর্ব প্রযুক্তির কথা নেই, বরং যা আছে তার সবই আক্ষরিক অর্থে ভূতপূর্ব, এমন অনেক প্রযুক্তি যা আধুনিক যুগে আমরা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই ধরে নিই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তার যে সব স্তর পার হয়ে সেই সব প্রযুক্তি পাওয়া গেছে, তার সঙ্গেই যেন আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন ভের্ন এই উপন্যাসটিতে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা গল্পের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আগে উল্লিখিত অন্য একটি গল্পের মতো এটিও রুশ ভাষায় লেখা, লেখকের নাম আনাতোলি নেপ্রভ। বহুকাল আগে এর একটি বাংলা অনুবাদ পড়েছিলাম। অনুবাদকের নাম ভুলে গেছি, তবে গল্পটা পরিষ্কার মনে আছে, অনুবাদে নাম ছিলো 'কুকলিঙের কাঁকড়া' যে কথাও মনে আছে [৩]। কুকলিং এক বিজ্ঞানী। গল্পের শুরুতে দেখা যাচ্ছে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের একটি ছোট্টো দ্বীপে তিনি নামলেন জাহাজ থেকে, সঙ্গে বাক্সোভর্তি মালপত্র। সেই মালপত্র আর একজন সঙ্গীকে নিয়ে কুকলিং রইলেন দ্বীপে। জাহাজ বিদায় নিলো অন্য সবাইকে নিয়ে, আবার হপ্তা তিনেক বাদে ফিরবে। মালের বাক্সো থেকে বেরোলো

লোহা ও অন্যান্য ধাতুর অনেক টুকরো, সেগুলো ছড়িয়ে রেখে দেওয়া হলো সারা দ্বীপে। আর বেরোলো একটি ছোট্টো খেলনার মতো জিনিশ, দেখতে খানিকটা কাঁকড়ার মতো। সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তরে কুকলিং জানালেন, এই কাঁকড়া দিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে এসেছেন ডারউইনের 'যোগ্যের জয়' নীতি এবং বিবর্তনবাদের অআকখ। কাঁকড়ার পিঠে লাগানো আছে আয়নার মতো কাচ, তা দিয়ে রোদ্দুর সংগ্রহ করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কাঁকড়া। শুঁড় বা দাঁড়ার মতো দেখতে দুটো জিনিশ আছে, প্রখর রোদে সেগুলোর মাঝখানে ফুলকি দেখা দিতে পারে, এবং তা দিয়ে ঝালাই করার মতো কাজ করতে পারে এই কাঁকড়া। প্রথমে একটি কাঁকড়া দিয়ে শুরু হয়েছিলো, ক্রমশ দেখা গেলো চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া ধাতু থেকে নতুন নতুন কাঁকড়ার 'জন্ম' হচ্ছে। বংশবৃদ্ধি হতে থাকলো, কিন্তু কিছুদিন পরে সঞ্চিত লোহার পরিমাণে টান ধরলো, তখন শুরু হলো জীবনসংগ্রাম। গল্পের শেষটা বলার দরকার নেই, এটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রাণের বিকাশ এবং খাদ্যের জন্য প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত আমাদের যাবতীয় ধ্যানধারনাই নতুন চোখে দেখা হয় এই গল্পটি পড়ার সময়ে। সার্থক কল্পবিজ্ঞান।

ওপরের কয়েকটি নমুনা থেকেই আশা করি বোঝা যাচ্ছে, কল্পনা অনায়াসে বিজ্ঞানভিত্তিক হতে পারে। বিজ্ঞানের কথা উপেক্ষা না করলে কল্পনা করা যায় না, এটা নেহাত বাজে কথা। বিজ্ঞানীরা নিজেরাই ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্ধারণ করেন কল্পনার সাহায্যে। গল্পকারের স্বাধীনতা আরো বেশি, তিনি বিজ্ঞান ছাড়াও আরো নানা রকমের উপাদান যোগ করতে পারেন।

যেমন ধরা যাক প্রেমেন্দ্র মিত্রর গল্পে। ঘনাদা সিরিজের বহু গল্পই কল্পবিজ্ঞান গোত্রের, কিন্তু তার মধ্যে বিজ্ঞানের ইঙ্গিত ছাড়াও থাকে আরো অনেক উপাদান। প্রতিটি গল্পেই থাকে ঘনাদাকে দিয়ে গল্প বলিয়ে নেওয়ার এক উপভোগ্য গৌরচন্দ্রিকা, কোনো গল্পে থাকে ভূগোলের চমকপ্রদ কোনো তথ্য, কোনো গল্পে থাকে ইতিহাসের উপাদান। বিজ্ঞান নিয়ে যা থাকে, তাতে কোনো খাদ নেই, বিজ্ঞানের সাহায্যেই নতুন কিছু কল্পনার দরজা খুলে দেওয়া হয়। 'ফুটো' গল্পে যেমন, প্রায় নিমেষে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে গেছেন ঘনাদা, বিজ্ঞানী মিনোস্কির সঙ্গে। কী করে হলো? মঙ্গলের যা দুরত্ব, তাতে "ঘণ্টায় চার হাজার মাইল ছুটেও মাস দেড়েকের আগে" যে পৌঁছোনো সম্ভব নয়, সে কথা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ঘনাদা। উত্তরে মিনোস্কি জানিয়েছেন,

*"এসেছি ফুটো দিয়ে গলে! ...মহাশূন্যের ফোর্থ ডাইমেনসন্ মানে চতুর্থ মাপের ফুটো।...*

*ব্যাপারটা তোমায় আর একটু ভাল করে বোঝাই। খুব লম্বা একটা চিমটে মনে*

*করো। এক দিকের ডগা থেকে আর এক দিকের ডগায় পৌঁছতে হ'লে একটা পিঁপড়েকে সমস্ত চিমটেটা মাড়িয়ে যেতে হবে। তাতে তাকে হাঁটতে হবে ধরো তিন গজ। কিন্তু চিমটের একটা ফলা থেকে আর একটা ফলা মাত্র এক ইঞ্চি দূরে যদি থাকে, আর ওপরের ফলা থেকে নিচের ফলায় যাবার একটা ফুটো যদি পিঁপড়েটা পায়, তা হ'লে এক ইঞ্চি নেমেই তিন গজ হাঁটার কাজ তার সারা হয়ে যাবে। লম্বা, চওড়া ও উঁচু—এই তিন মাপের জগতে যা অনেক দূর চতুর্থ মাপ দিয়ে সেখানে অতি সহজে পৌঁছবার এমন অনেক ফুটো মহাশূন্যে আছে।''* [৪:৩১৩]

তেমনি একটা ফুটোই নাকি খুঁজে পেয়েছিলেন মিনোস্কি।

অনুরূপ কল্পনা নিয়ে মার্কিন দেশে ম্যাডেলাইন লেঙ্গল একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, "A wrinkle in time", সেটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬২-তে। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবে 'ফুটো' লিখেছিলেন জানি না, গজ-ইঞ্চি-মাইল ইত্যাদি প্রাক-মেট্রিক এককের বাহুল্য দেখে আন্দাজ হয় ভারতে মেট্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের আগে, অর্থাৎ ১৯৫০-এর দশক বা তারও আগে। দেশকালের মধ্যে wormhole নামক ফুটো থাকতে পারে সে কথা বিজ্ঞানীদের অজানা ছিলো না, কিন্তু এ নিয়ে ভালোরকম আলোড়ন ওঠে তার অনেক পরে, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে। তার বহু আগে এই কল্পবিজ্ঞান লেখকদের কল্পনায় বলা হয়েছে এই সব সম্ভাবনার কথা। এ সম্ভাবনা এখোনো বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

শুধু এই একটি গল্পে নয়, আরো বহু গল্পে বিজ্ঞান নিয়ে এমনি অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে তুলে দিয়ে যান প্রেমেন্দ্র মিত্র। 'পৃথিবী বাড়ল না কেন' গল্পে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যার এক আশ্চর্য দাওয়াইয়ের সন্ধান দিয়েছেন, 'জয়দ্রথ বধে ঘনাদা' গল্পে সূর্যগ্রহণ থেকে ইতিহাসের কালনির্ণয় কীভাবে করা যায় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এবং এই যে কটি গল্পের উল্লেখ করলাম সেগুলো সামান্য কয়েকটি নমুনা মাত্র। এ কথা বলতে কোনো বাধা নেই যে, জগদীশচন্দ্রের যে গল্পটির কথা আগে উল্লেখ করেছি সেরকম দু-একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত বাদ দিলে বাংলায় ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প রচনার সূচনা হয়েছিলো প্রেমেন্দ্র মিত্রর হাতে, এবং সূচনাতেই তিনি এই ধারার কাহিনীতে তিনি এমন একটা সমৃদ্ধির জোয়ার এনেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অববাহিকায় যা রীতিমতো অকল্পনীয়। তাঁর প্রদর্শিত পথে আরো অনেকেই চলেছেন। ছোটোবেলায় পড়তে খুব ভালো লাগতো ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যর গল্প, বড়ো হয়ে উপভোগ করেছি অনীশ দেবের লেখা। আরো অনেকের নাম করা যায়, কিন্তু এ লেখাটি কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাস নয়, তাই সবার কথা বলার কোনো দায় আমার নেই।

আমার আলোচ্য বিষয়—একটা গল্পে কী উপাদান থাকলে তাকে কল্পবিজ্ঞান বলা যেতে পারে। আগেও বলেছি, আবারও বলছি—যে গল্প বিজ্ঞান সম্পর্কে পাঠককে ভাবায় বা সচেতন করে, সেই গল্পই কল্পবিজ্ঞান অভিধা পেতে পারে। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের একটি গল্পে পড়েছিলাম, মহাকাশ ভ্রমণ সেরে ফিরে আসার পরে দেখা গেলো, একজন মহাকাশযাত্রীর ওজন বিশালরকম বেড়ে গেছে। গল্পটি হাতের কাছে নেই, এই লেখকের এই জাতীয় গল্পের কোনো সংকলনও কখোনো দেখেছি কিনা মনে করতে পারছি না। স্মৃতি থেকে বলছি, শেষ পর্যন্ত ওই গল্পে বোঝা যায়, মহাকাশে কোনো এক অঞ্চলে প্রচুর নিউট্রন ছিলো, সেখান থেকে অনেক নিউট্রন শুষে নিয়েছে ওই ব্যক্তির শরীর। অনীশ দেবের একটি গল্পে পড়েছি, সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে মেঘের মতো একটি বস্তুপিণ্ড এসে পড়েছে যা সূর্যের আলোর নীল ছাড়া অন্যান্য রং শুষে নিচ্ছে, তাই পৃথিবীতে সবকিছু নীল দেখাচ্ছে। এই ধরনের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এবং এর মধ্যে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কোনো চিন্তা আছে বলেই এই সব গল্প সার্থক কল্পবিজ্ঞান।

বাংলায় যে বিজ্ঞানী চরিত্রটি সবচেয়ে সমাদৃত সেই প্রোফেসর শঙ্কুর কথা এ প্রসঙ্গে একবারও তোলা হলো না দেখে বাঙালি পাঠক হয়তো খানিকটা আশ্চর্য হতে পারেন। আসলে, একেবারে যে বলা হয়নি তা নয়, বিধুশেখর নামক যে রোবটের কথা আগে বলা হয়েছিলো সেটা প্রোফেসর শঙ্কুরই উদ্ভাবন। কিন্তু সেই যন্ত্রমানব সম্পর্কে যে কথা বলেছিলাম সে কথা সামগ্রিকভাবে গোটা প্রোফেসর শঙ্কু সিরিজের সম্পর্কেই প্রযোজ্য—অর্থাৎ সে গল্পগুলোয় কল্পনা আছে, কিন্তু এমন কিছুই নেই যা থেকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত কোনো চিন্তা আমাদের মাথায় আসে। সত্যজিতের তরতরে ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য টানের জন্য, মৃদু হাস্যরসের ছোঁয়ার জন্য, এবং হয়তো খানিকটা প্রোফেসর শঙ্কুর করুণ হামবড়াইপনার জন্যও এ সব গল্প পড়ে ভালো লাগে, অন্তত অনেকেরই যে লাগে তার অকাট্য প্রমাণ এই সিরিজের ব্যবসায়িক সাফল্য, কিন্তু এ গল্পগুলোর কোনোটাই কল্পবিজ্ঞান নয়।

কল্পবিজ্ঞানের মধ্যে কল্পনা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে বিজ্ঞানও। বহু কল্পবিজ্ঞান কাহিনীর রচয়িতা আইজাক আসিমভ একটি লেখায় [৫] কনিষ্ঠদের প্রতি উপদেশ দিয়েছেন, কীভাবে লেখা যায় এই গোত্রের সাহিত্য। সেখানে তাঁর প্রথম সুপারিশ, লিখতে হলে ইংরিজি ভাষাটা জানতে হবে ভালো করে। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যে সেটা আবশ্যিক নয়, ইংরিজি ছাড়াও অন্য বহু ভাষাতেই কল্পবিজ্ঞান লেখা সম্ভব, এবং লেখা হয়েছেও। যাই হোক, একটু সংস্কার করে তাঁর এই উপদেশটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি—যে ভাষায় কেউ লিখতে চান সেই ভাষাটি তাঁকে জানতে হবে ভালো

করে। যে কোনো ধরনের সাহিত্য রচনার জন্যই সেটি প্রাথমিক প্রয়োজন। এর পরেই দ্বিতীয় যে উপদেশ আসিমভের, তা হলো—বিজ্ঞান জানতে হবে। আসিমভ পুনশ্চ যোগ করছেন, তার মানে এই নয় যে বিজ্ঞানের কোনো বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকা দরকার। ডিগ্রি থাকুক বা না থাকুক, বিজ্ঞান জানতে হবে, দরকার হলে নিজে পড়েও জানতে হবে। নইলে কল্পবিজ্ঞান লেখা যাবে না।

তা না হলে যা লেখা হবে, তাতে বিজ্ঞানের ভেক ধরে ছেলেখেলা হবে, বাজে বকা হবে। কার্ল সাগান একটি রচনায় [৬] ব্যাখ্যা করেছেন কল্পবিজ্ঞান সম্পর্কিত তাঁর চিন্তাভাবনা, তাতে তিনি বলেছেন, 'স্টার ট্রেক' দেখার সময়ে নাকি তাঁর বন্ধুরা বলেছিলেন যে এর ঘটনাগুলোকে আক্ষরিকভাবে ধরলে চলবে না, ধরতে হবে ভাবার্থে। কী সে ভাবার্থ, তা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সাগান। যখন তিনি দেখেছিলেন পৃথিবী থেকে যাত্রা করে ব্যোমযাত্রীরা পৌঁছেছেন দূরের এক গ্রহে, এবং সেখানে রয়েছে যুযুধান দুই মহাশক্তি, যাদের নাম 'ইয়াং' এবং 'কম', যা দেখলেই 'ইয়াংকি' এবং 'কমিউনিস্ট' কথা দুটো মনে পড়া অনিবার্য এবং রুশ-মার্কিন ঠান্ডা লড়াইয়ের কথা না ভাবা অসম্ভব, তখন তা দিয়ে বিজ্ঞানের ঠিক কী বার্তা প্রকাশ করা হচ্ছে তা বুঝতে যদি সাগানের অসুবিধা হয়, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তার ওপরে যখন তাঁকে দেখতে হয় ভালকান নামক প্রজাতির সঙ্গে মানুষের সম্মিলনে জন্ম নিচ্ছে সন্তান, তখন বিস্ময় ও বিরক্তি চরমে উঠেছে তাঁর, তিনি বলে ফেলেছেন, অণুজীববিদ্যা সম্পর্কে আমরা যা কিছু জেনেছি তার সবই শিকেয় তুলে না রাখলে এ ব্যাপার মেনে নেওয়া মুশকিল। বলেছেন, ভালকান এবং মানুষের সংকর প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা মোটামুটি মানুষ ও পেটুনিয়া গাছের সংকর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে তুলনীয়। কল্পবিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানের বিকৃতি করার অপচেষ্টাকে সাগান বলেছেন 'terrible wasted opportunities'।

সত্যি এ ধরনের প্রয়াস শোচনীয়। কেননা বিজ্ঞান জানলে একটা কথা খুব সহজেই বোঝা যায় যে, রোমাঞ্চকর উপাদানের জন্য বিজ্ঞানের বিরোধী কিছু বলার কোনো দরকার হয় না। বিজ্ঞান নিজেই অত্যন্ত রোমাঞ্চকর, অনেক অভাবনীয় আবিষ্কারের সমষ্টি। সাগান এমন কথাও বলেছেন যে, কল্পবিজ্ঞান পাঠের রোমাঞ্চ থেকেই যদিও তাঁর বিজ্ঞান পড়ার ইচ্ছে জেগেছিলো, বিজ্ঞান পড়তে গিয়ে তিনি বুঝেছেন যে বিজ্ঞান আসলে কল্পবিজ্ঞানের চেয়েও আরো সূক্ষ্ম, আরো জটিল, আরো রোমহর্ষক।

তার মানে এই নয় যে কল্পবিজ্ঞানের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং ঠিক উল্টোটা—ঠিক এই কারণেই কল্পবিজ্ঞানের প্রয়োজন। বিজ্ঞানের রোমাঞ্চকর জগতের

সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য দরকার কল্পবিজ্ঞান। বিজ্ঞান আমাদেরকে যা শিখিয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সহজে একটা পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য দরকার কল্পবিজ্ঞান, বিজ্ঞান যেদিকে এখোনো দৃষ্টিপাত করেনি সে বিষয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করে দেওয়ার জন্য দরকার কল্পবিজ্ঞান। আশা করি, এ কথার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, আগে যে কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করেছি সেগুলোর উদাহরণই যথেষ্ট।

## উল্লেখপঞ্জী


১. জগদীশচন্দ্রের এ গল্পটি নানা সংকলনে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ৭ নং সূত্রের ১১-১৬ পৃ. দ্রষ্টব্য।

২. ইভান ইয়েফ্রেমভ, "গল্প-সংকলন", বাংলা অনুবাদ : শুভময় ঘোষ (বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়, মস্কো, প্রকাশকাল নেই বইয়ে)। উল্লিখিত গল্পটি আছে বইয়ের ১৫৫-১৭৪ পৃষ্ঠায়।

৩. এই রচনাটি লিখবার সময়ে দেখলাম, গল্পটির একটি ইংরিজি অনুবাদ পাওয়া যায় আন্তর্জালে http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/15r.pdf ঠিকানায়। ঠিকানা দেখে মনে হয় না এই প্রকাশ লেখকের অনুমোদিত। কেউ একজন গল্পটি নিজের খেয়ালে আপলোড করে দিয়েছেন।

৪. প্রেমেন্দ্র মিত্র, "অফুরন্ত ঘনাদা" (সাক্ষরতা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬)। অবশ্যই ঘনাদার গল্প পাওয়া যায় আরো নানা সংকলনে।

৫. Isasc Asimov. 'Hints'। লেখকের "Gold" (Harper Collins Publishers, 1995, ISBN 978-000-648-202-3) বইয়ের ৩৪৫-৩৫০ পৃ.।

৬. Carl Sagan, 'Science fiction—a personal view'। লেখকের "Broca's brain" (Ballantine Books, 1980, ISBN 0-345-28823-8) বইয়ের ১৬২-১৭২ পৃ.।

৭. হান্নান আহসান (সম্পাদক), "সব গল্পই কল্পবিজ্ঞানের" (জ্ঞান বিচিত্রা, আগরতলা, ২০০৪)।